রাজনৈতিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

রাজনীতির প্রসঙ্গ থাকলেই কোনো উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাসের শিরোপা দেওয়া যায় না; সেক্ষেত্রে যে কয়টি বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেগুলি হল: ক. উপন্যাসটির মূল ঘটনা রাজনৈতিক ঘটনা কিনা, খ. নায়ক-নায়িকা রাজনৈতিক চরিত্র কিনা, গ. উপন্যাসটির আদ্যন্ত বিকাশের মধ্য দিয়ে লেখকের বিশিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধান স্থান অর্জন করছে কিনা, এবং ঘ. সেই উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতিতে পাঠকচিত্তের রসাবেশের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞান রয়েছে কিনা। এই শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে তবেই কোনো উপন্যাসকে দেওয়া যাবে রাজনৈতিক উপন্যাসের শিরোপা। এই শর্তগুলোর নিরিখে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের পর্যালোচনা করা এইজন্য জরুরি যে উপন্যাসটিতে রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করেছে, যদ্দৃষ্টে কেউ কেউ একে রাজনৈতিক উপন্যাস মনে করেন।

প্রমথ চৌধুরি 'ঘরে-বাইরে'কে মনে করেছিলেন 'রূপক'। তাঁর ধারনায় নিখিলেশ প্রাচীন ভারতবর্ষের রূপক, সন্দীপ নব্য ইউরোপের রূপক, আর বিমলা প্রাচীন ভারত আর নব্য ইউরোপের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অস্থির আধুনিক ভারতবর্ষের রূপক। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি সঠিক হত তবে 'ঘরে-বাইরে'কে প্রকারান্তরে রাজনৈতিক রচনা বলেই স্বীকার করতে হত। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' রূপকও নয়, এ-উপন্যাসে রাজনীতিও সেভাবে প্রবেশ করেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাই প্রসন্ন হননি প্রমথ চৌধুরির ব্যাখ্যায়। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রে (২৯ ফাল্গুন ১৩২২) তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন "এরমধ্যে কোনো জ্ঞানকৃত রূপকের চেষ্টা নেই, এ কেবলমাত্রই গল্প।"

যে সময়-পটভূমিতে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ঘটনাধারা উৎসারিত হচ্ছে ভারতবর্ষ—বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সেই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৩-এর ৩ ডিসেম্বর বাঙালির জাতীয়তাবোধ এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের শক্তিকে দমন করার জন্য বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ১৯০৩-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতি লালমোহন ঘোষ এ অভিসন্ধির প্রতিবাদ করেন। এরপর ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সারা দেশে ওই অভিসন্ধির প্রতিবাদে অসংখ্য সভা করা হয় এবং সরকারের কাছে শতাধিক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ শাসকবর্গ ১৯০৫-এর ২০ জুলাই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবে সম্মতি দান করে এবং ১৫ অক্টোবর থেকে ওই প্রস্তাব কার্যকর করা হবে বলে ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে তৎকালীন চরমপন্থী কংগ্রেসীদের নেতা 'সঞ্জীবনী পত্রিকা'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ১ আগস্ট প্রথম বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব দেন এবং ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে আয়োজিত সভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভাতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্লোগান হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। বয়কটের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের কাজ শুরু হয়। স্মরণ করব, এই দায়িত্ব নিয়েই সন্দীপ নিখিলেশের তালুকে এসে

উপস্থিত হয়েছিল। সুতরাং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ঘটনা প্রত্যক্ষত শুরু হয় এই সময় থেকেই, যদিও উপন্যাসের এই আরম্ভের আগের আরম্ভ হয়েছে আরো আগে, নিখিলেশের বিয়ের পর— বিশেষ করে তার এম.এ. পাস করে গ্রামে ফিরে দাম্পত্য জীবন শুরু এবং জমিদারি দায়িত্ব গ্রহণের সময় থেকে।)

উপন্যাসে সন্দীপের আগমন রাজনীতির ঘাড়ে চেপে, কিন্তু উপন্যাসের ঘটনা পটভূমির ঠিক যে বিন্দুতে সে অবস্থান করছে—সেখানে রাজনীতি নেই। তার রাজনীতির ক্ষেত্র নিখিলেশের ভদ্রাসনের বাইরে থেকে হরিশ কুণ্ডুর জমিদারি এলাকায় প্রসারিত, নিখিলেশের বাড়ির ভিতর তার রাজনীতির কোনো প্রভাব নেই। বিমলাকে সে বলেছিল বটে "আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী। আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব। কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে।"—কিন্তু এসব সবই সন্দীপের স্তোকবাক্য। এসব কথায় বিমলাকে ভুলিয়ে সে নিজের স্থূল লালসা চরিতার্থের দিকে টেনে আনতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত তাই সে এনেছে। বিমলাকে সে আদৌ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চায়নি, দেশপ্রেমের কথা বিমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার অছিলা মাত্র। তাই বিমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর সে নির্দ্বিধায় দেশের কথা ফেলে দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এ বাড়িতে অমূল্যকে সে একদা নিয়ে এসেছিল বিমলার দৃষ্টি-জ্যোতিতে যুবকেরা কীভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারে তারই প্রমাণ দিতে— অর্থাৎ একটি সাজানো নাটকের অভিনয় দেখিয়ে বিমলাকে বিভ্রান্ত করতে। বস্তুত সন্দীপ যতদিন বিমলার চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে ততদিন বিমলা রাজনীতি নিয়ে ভাবার অবকাশই পায়নি। বিমলা তার স্বামীর কাছে সন্দীপের কথা শুনেছিল, দেশের নাম করে স্বামীর কাছে বারবার টাকা নেওয়ায় সন্দীপের প্রতি বিরক্তই ছিল সে; কিন্তু তাদেরই নাটমন্দিরে সন্দীপকে ভাষণ দিতে দেখে তার মানসিক পরিবর্তন হল। সেই মানসিক পরিবর্তনের পেছনে স্বদেশ প্রেম অবশ্যই ছিল, কিন্তু passion-ও ছিল। সন্দীপকে সে বাংলাদেশের বীর আর নিজেকে বাংলার নারীকুলের প্রতিনিধি হিসাবে কল্পনা করেছিল। এই তার passion। সে যে একদিন নিখিলেশের মতবাদের বিরোধিতা করে বলেছিল— 'আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব, যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।'—এ কেবল সন্দীপের কথার প্রতিধ্বনি। এ যদি তার নিজের উপলব্ধির কথা হত তবে অমূল্যের হাতে রিভলবার দেখেই সে চমকে উঠত না। রিভলবার দেখেই যে আঁৎকে উঠে 'বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে' দেওয়া তার কাজ নয়। বস্তুত অমূল্যর হাতে রিভলবার দেখবার পরেই বিমলার মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা এসেছে। সে বুঝতে পেরেছে দেশপ্রেমের নাম করে সন্দীপ এই যে দেশের অমূল্যপ্রাণ যুবকদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিয়েছে তা তাদের মানব-হত্যার পথেই ঠেলে দিচ্ছে এবং এ পথে দেশের কল্যাণ নেই। এই উপলব্ধির পরেই বিমলা রাজনীতি-সচেতনতার সেই বিন্দু খুঁজে পেয়েছে যেখানে দাঁড়ালে নিখিলেশকে দেখতে পাওয়া যায়, সন্দীপকে যায় না।—সন্দীপের যে রাজনীতি— বয়কটের রাজনীতি, বিদেশি দ্রব্য বর্জন—দরকার হলে বলপ্রয়োগ করে বিদেশি দ্রব্য বর্জনে মানুষকে বাধ্য করানো, বিদেশি দ্রব্য কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, বিদেশিদ্রব্যের কারবারির নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া, হাটে বিদেশি দ্রব্য বেচাকেনার আদেশ না দিলে নিখিলেশের

মতো জমিদারদের বেনামি চিঠি পাঠিয়ে কিংবা সংগঠিত যুবকদের পাঠিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা, প্রাণ হত্যার ধম্‌কি দেওয়া—এসব শেষ পর্যন্ত কখনোই উপন্যাসের মৌল সমস্যা হয়ে ওঠেনি। তাই সন্দীপের এই সব যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঔপন্যাসিক কখনোই সরাসরি ঘটতে দেখাচ্ছেন না; প্রত্যেকটি ঘটনাই কোনো-না-কোনো চরিত্রের বর্ণনায় হাজির করছেন পাঠকের কাছে। সূক্ষ্ম আঙ্গিক-কুশলতায় সন্দীপের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে তিনি গুরুত্বের দিক থেকে দেখিয়েছেন গৌণ করেই।

নিখিলেশের মধ্যেও সুগভীর দেশপ্রেম, রাজনীতি-সচেতনতা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে। নিখিলেশের এ রাজনৈতিক চিন্তাধারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিবিম্বন। একটি চিঠিতে এন্ড্রুজকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "I love India, but my India is an idea and geographical expression." ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি শুনি নিখিলেশের কণ্ঠে : 'দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই।'— নিখিলেশ স্থিতধী, দেশসেবা তার কাছে সাধনার মতো। দেশকে সে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলতে চায়। তাই দেশের লোকের সঞ্চয় বুদ্ধির বিকাশের জন্য সে ব্যাঙ্ক খুলেছে এবং চড়া সুদ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের জন্য অনেক খেজুর গাছ থেকে পাইপ দিয়ে একত্র রস সংগ্রহ করে চিনি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরীযাত্রার জাহাজ কোম্পানি খুলেছে, দেশি কলে সুতো তৈরি করিয়ে দেশি কারখানা খুলে তাঁতিকে দিয়ে কাপড় তৈরি করিয়েছে; বস্তুত, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তার উদ্যোগের শেষ নেই। আবার, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারেও সে অত্যন্ত উৎসাহী। নিজের বসার ঘরে বিদেশি ফ্লাওয়ার ভাসের বদলে সে রাখে ছোট ঘটি, মেজোরানীর অনুরোধে সোৎসাহে সে এনে হাজির করে রাশি-রাশি দেশি সাবান, দেশি কলম, দেশি কাঁইচি। কিন্তু তাই বলে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের সে পক্ষপাতী নয়। বিদেশি দ্রব্য দামে সস্তা এবং টেকসই; সুতরাং দেশের গরিব মানুষ যে বিদেশি দ্রব্য কিনবেই তা সে সহজেই অনুভব করে, কিন্তু জোর করে গরিব মানুষকে বেশি দাম দিয়ে স্বদেশী দ্রব্য কিনতে বাধ্য করার অর্থ যে তাদের উপর জুলুম এবং অত্যাচার করা তা-ও সে বোঝে। যে-কোনো জুলুম বা অত্যাচারেরই সে বিরোধী। তাই কিছুতেই সে তার হাট থেকে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের আদেশ জারি করে না। তবে হাটে বিদেশি দ্রব্যের সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যও রাখার ব্যবস্থা করে সে যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা চাইলেই স্বদেশী দ্রব্য কিনতে পারে। সে মনে করে দেশের মানুষ যতদিন স্বেচ্ছায় স্বদেশীকে গ্রহণ না করছে ততদিন স্বদেশী দ্রব্যের স্থায়ী ভবিষ্যৎ নাই। দেশের সমস্ত মানুষ যাতে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করে তার জন্য তাকে বিদেশি দ্রব্যের তুলনায় গুণ-মানে উন্নত, শস্তা এবং চাহিদার তুলনায় সুপ্রতুল হওয়া চাই। অর্থাৎ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও নিখিলেশ সর্বসাধারণের স্বাধীনতা এবং আত্মোন্নতির পক্ষপাতী। কোনো প্রকার হুজুগে মেতে ওঠার পাত্র সে নয়। সে মনে করে "দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার ক'রে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবল সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি।"—নিখিলেশ বোঝে সন্দীপ এই নেশায় নেশাগ্রস্ত। এ নেশায় অনেককেই সে নেশাগ্রস্ত করে তুলছে। এও সে বোঝে যে তার এ ক্রিয়াকলাপ মুসলিম বহুল এ এলাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলবে।

উপন্যাসের পরিণতিতে তার ধারণা সত্য প্রমাণিত হতে দেখা গেছে। সন্দীপের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধ আছে, তবু তার উপর কোনো জবরদস্তি যে সে করেনি— তার কারণ সে সর্বপ্রকার জবরদস্তির বিরোধী। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে, তবু প্রতিপক্ষের সঙ্গে সে সংঘর্ষে লিপ্ত নয়। এ উপন্যাস রাজনৈতিক উপন্যাস হলে অথবা নিখিলেশ রাজনৈতিক চরিত্র হলে এই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠত। কিন্তু নিখিলেশ রাজনৈতিক চরিত্র নয়, বিমলা তো নয়ই; এই উপন্যাসও নয় রাজনৈতিক উপন্যাস। সন্দীপ রাজনৈতিক চরিত্র হলেও এই উপন্যাসের মূল ঘটনায় তার রাজনৈতিক ভূমিকা নয়, এক নারীর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের ভূমিকা। সন্দীপের ভ্রান্ত রাজনীতির প্রত্যাঘাত উপন্যাসের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করলেও তা কোনো রাজনৈতিক বোধ বা অভিজ্ঞতা উদ্বারিত করছে না, যা উদ্‌বারিত করছে সেটা বিমলার উদ্‌বেগ—ব্যথাঘেরা এক শম-স্থিতি। এই শম্‌-স্থিতি থেকে বিমলা জানতে চাইছে তার ভাগ্যের নির্দেশ। অর্থাৎ, উপন্যাসের পরিণতিকে আপাত দৃষ্টিতে রাজনীতির প্রতিক্রিয়া তথা রাজনৈতিক মনে হলেও, বস্তুত তা নয়। সুতরাং রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাবে না 'ঘরে-বাইরে'-কে, রাজনীতি-এর পটভূমি, না এর শরীর, না এর আত্মা।

তবে কি জাতের উপন্যাস ঘরে বাইরে? এ উপন্যাসের মৌল বিষয় প্রেম। নিখিলেশ এর নায়ক, নায়িকা বিমলা। নারীকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধা জলের বরাদ্দের মতো তার যে ভালোবাসাটুকু পাওয়া যায়, তাই নিয়ে ভারতীয় পরিবারে গড়ে উঠেছে দাম্পত্য সম্পর্ক। নিখিলেশ মনে করেছে এ হেন দাম্পত্য সম্পর্কে না নারীর সম্মান আছে, না পুরুষের। নারীকে মুক্তি দিতে হবে বহির্বিশ্বের মধ্যে; শিক্ষায়, আধুনিক জীবনাচারে, মননে তার ব্যক্তিত্ব—তার নিজস্ব রুচি গড়ে তোলার অবকাশ দিতে হবে, স্বাধীনতা দিতে হবে যে পুরুষটিকে সে পেয়েছে জগৎ-সংসারে তার সঠিক মূল্য নির্ধারণের এবং সেই নির্ধারিত মূল্যে যতটুকু প্রেম একজন নারীর হৃদয়ে জন্ম নেবে একজন পুরুষের যথার্থ পাওনা ততটুকুই। নারীমুক্তি সন্নিহিত এ হেন প্রেমের অন্বেষায় তার প্রেম তথা দাম্পত্য-জীবনে যে সঙ্কট দেখা দিল—, অন্বেষার কাছে সৎ থাকতে গিয়ে যে নিবিড় মানসিক যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হল, কি করে— কোন্ মানসিক প্রক্রিয়ায় সে তা সহ্য করল, অন্যদিকে বিমলাই বা কোন্ মানসিক অবস্থায় স্বামীর নিবিড় প্রেমনীড় উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল স্খলনের পথে, আর কোন্ মানসিক অভিঘাতে আবার উঠে এল সে স্খলন থেকে, সন্দীপই বা কী মন নিয়ে দাম্পত্যের স্বর্গ থেকে বিমলাকে নামিয়ে এনেও শেষ পর্যন্ত তার সর্বনাশ করল না, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্তে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাসের শরীর ও আত্মা। প্রধান চরিত্র-ত্রয়ের অন্তর-জগতের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার এ হেন সর্বব্যাপী প্রাধান্যে আমাদের স্থির ধারণা—'ঘরে-বাইরে' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

সমস্যা হল, সাহিত্য-তাত্ত্বিকেরা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে উপন্যাসের পৃথক শ্রেণী বিভাজন করেননি। তা না-করার পেছনে তাঁদের পক্ষ থেকে যুক্তি হল বুঝি এই: উপন্যাস মাত্রেই মনস্তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক গতিপথে বিবর্তিত হয়; সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে আলাদা শ্রেণি নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।—ঠিক বটে যে যে-কোনো উপন্যাসেই মনস্তত্ত্ব থাকে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো উপন্যাসও পরিণতির দিকে এগিয়েছে চরিত্র সমূহের প্রকৃতি অনুযায়ী মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও তজ্জাত ঘটনাধারার দ্বান্দ্বিক প্রসৃতিতে। কিন্তু তাই বলে এ উপন্যাসকে কি আমরা কেউ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলব? পক্ষান্তরে, বহু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও 'চোখের বালি'-কে কি কেউ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো সামাজিক উপন্যাস বলবে?— বলা

যায় না তা, তাই যেখানে চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাসকে উপন্যাসের বিশিষ্ট শ্রেণি স্বীকার করা হয়, সেখানে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের শ্রেণিভাগ নির্ধারণ করা জরুরি। আসলে পাশ্চাত্যে সামাজিক উপন্যাসের পর চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসই লেখা হয়েছে, সঠিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসই বলা যায় এমন রচনা পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের ধারায় মোড় বদলের ভূমিকা নেয়নি, না সংখ্যায়, না মানে। বাংলা সাহিত্য এখানে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। এবং এই সাতন্ত্র্য-মর্যাদা তাকে পাইয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

যাই হোক, 'ঘরে-বাইরে'-কে আমরা কেন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে মনে করি, তা প্রমাণ করার জন্য আগে বলা দরকার মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অভিধা কি, কী-ই বা তার বৈশিষ্ট্য।

(যে উপন্যসে উপস্থাপিত যাবতীয় ঘটনার উৎস রূপে সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের মানসিক গতি-প্রকৃতিকে নির্দেশ করা হয়, মনের জট ছাড়িয়েই যেখানে আসে পরিণতি, চরিত্রেরা যেখানে বিবর্তিত হয় মনোবিবর্তনের ধারায় অথবা অন্যের মনোবিবর্তন বা তজ্জাত ঘটনার মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে, নায়ক বা নায়িকার অন্তিম মানস-প্রতীতিতে যেখানে উৎসারিত হয় উপন্যাসের রস তথা লেখকের জীবন-দর্শন, তাকেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাজানো যায় এইভাবে—

ক. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হবে পাত্র-পাত্রীদের মন, পারস্পরিক মনের আশা-আকাঙক্ষা, ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে এর কথাবস্তু;

খ. মানসিক সমস্যার জট ছাড়িয়ে নির্ণীত হবে এ উপন্যাসের পরিণতি;

গ. এ উপন্যাসে চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে তাদের মানসিক গতি-প্রকৃতি ও তার বিশ্লেষণ;

ঘ. নায়ক বা নায়িকার মনোদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে লেখকের জীবন-দর্শন।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে নারীমুক্তি সন্নিহিত দাম্পত্য প্রেমের নতুন পরিসর খুঁজতে চেয়েছিল নিখিলেশ। যা সে ভেবেছিল সেটা ফলিয়ে দেখতে চেয়েছিল নিজেরই দাম্পত্যে। সে ভেবেছিল সমাজের চাপ, ঘরের বন্ধন, অশিক্ষা চারিদিক থেকে নারীর মনকে ছোট করে রেখেছে;এতে পরিবার, সমাজ ও বহির্বিশ্ব মানুষ হিসাবে তার কাছে যা পেতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যেমন হয়েছে তার বৌদিদের বেলায়। বিমলাকে সে বের করে আনতে চাইল নারীর পুরনো আবেষ্টন থেকে। মিস গিলবিকে রেখে তাকে ইংরেজি লেখাপড়া শেখাল, নিজে পড়াল পলিটিক্যাল ইকোনমি, জ্যাকেট-জুতো ইত্যাদি আধুনিক পরিধেয়তে অভ্যস্ত করে তুলল, নিজের জীবন ও বন্ধুদের কথা বলে সচেতন করে তুলল বাইরের জগৎ সম্পর্কে। স্বামী মেয়েদের দেবতা এই ধারণাও সে ভাঙতে চাইল ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বিমলার স্বামী-প্রণামে হেসে। বিমলাকে সে বোঝালো: 'স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।'—এই ভাবে প্রস্তুতির পর বিমলাকে সে বলল: 'তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।'

নিখিলেশের এ আবেদনে উদ্বুদ্ধ হয়নি বিমলা, কিন্তু চিকের অন্তরাল থেকে যেদিন সে নাটমন্দিরে জমায়েত স্বদেশীদের ভীড়ে সন্দীপকে অগ্নিশ্রাবী ভাষণ দিতে দেখল, সেদিনই তার চিত্ত-বিভ্রম হল; সন্দীপকে মনে হল বাংলাদেশের বীর, আর নিজেকে বাংলাদেশের সকল

নারীর প্রতিনিধি। এই ভাবনাই তার স্খলনের প্রথম সোপান। পরদিন সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালো বিমলা। সেই অছিলায় পরিচিত হল সন্দীপের সঙ্গে। সন্দীপের কামনা দৃষ্টিতে তার সারা অন্তর যে প্লাবিত হয়ে উঠল নতুন স্রোতে সেটা সে বুঝতে পারল, চন্দ্রনাথবাবুর আশীর্বাদকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে রক্ষার শক্তি সঞ্চয় করতে চাইল সে। কিন্তু পারল না, ভেসে গেল কথার জাদুকর সন্দীপের কথা-স্রোতে। পরিচয়ের আগে সন্দীপের প্রতি বিমলার বিদ্বেষ ছিল তার চোখ স্বামীর টাকার দিকে ভেবে, সন্দীপের ফটো দেখে তার মনে হত তার ঠোঁটের কোণে আছে কামনার আভাস, পরিচয়ের পরও স্বামীর সঙ্গে সন্দীপের তুলনা করে তার মনে হয়েছে—'আমার স্বামীর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না' কিম্বা, 'সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র', তবুও আত্মসংবরণ করতে পারল না বিমলা।—'বাইরে' আছে ভালো ও মন্দ, আছে সন্দীপ, আছেন চন্দ্রনাথবাবু, বিমলা ভেসে গেল সন্দীপের আশ্লেষের টানে।

যতই আদর্শনিষ্ঠ হোক, নিখিলেশও মানুষ। তাই প্রিয়ার এ বেপথুগামিতায় আহত হল সে; সে নিজেই জানাচ্ছে: 'কাজকর্ম করছি, কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে।'—এই বেদনা কিছুদিনের জন্যে হলেও তাকে বিশ্ববিস্মৃত করেছে—'কিন্তু সমাজের দিক থেকে— সে-সব কথা সমাজ ভাবুক গে, যা করতে হয় করুক। আমি কাঁদছি, আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়।'—এ কান্নায় তার মন এমনই আতুর যে নারীর কল্যাণী হস্তের শ্রী ও সেবা দেখতে সে গেছে দূর সম্পর্কীয় দরিদ্রা বোন মনুর বাড়িতে, অথবা সমব্যথী মেজোরাণীর রাত্রি জাগরণ ও দরদ দেখে মুগ্ধ আবেগে তাকে প্রণাম করেছে।

মনের এ বেদনা-দ্রবণ থেকে নিখিলেশ নিজেকে উদ্ধার করেছে চুরি করা নারকেল ফেরৎ দিতে আসার ঘটনায় প্রতিফলিত পঞ্চুর সততাকে আশ্রয় করে, ভেবেছে: 'পঞ্চুর এই কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখ-দুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।" বস্তুত এর পর আর নিখিলেশকে ব্যক্তিগত দুঃখে অভিভূত দেখি না। তার কাছে প্রেম বড়, তার চেয়ে বড় সত্য। চতুর্থ আত্মকথার শেষে সে প্রার্থনা করেছে, "হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।—কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিও না ছলনার ছদ্ম স্বর্গলোকে। আমাকে একলা পথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক!"—এই প্রার্থনায় শক্তি সঞ্চয় করেছে নিখিলেশ, বিমলার উপর কোনোদিন সে রাগ করেনি, তাকে পরামর্শ দিতে যায়নি, শাসন করেনি, এগুলোর কোনো একটি করলেই তাকে বুঝতে হত বিমলাকে সে সত্য-সত্যই স্বাধীনতা দিতে চায়নি। বস্তুত বিমলাকে কায়মনোবাক্যে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিল বলেই বিমলার উপর থেকে বন্ধন পর্যন্ত উঠিয়ে নিতে চেয়েছে সে, তাকে সে স্পষ্টত জানিয়েছে—'এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর কিছু না হতেই পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাতকড়া হব না।'

—এই ছুটি পেয়েই বিমলার মোহাচ্ছন্নতা কেটে গেছে, ভেবেছে, "ছুটি কি একটা জিনিস? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি'—তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারিনে, বাঁচতেও পারি নে।"—যে মেয়ে সতীত্বের প্রার্থনা নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু

করেছিল, দাম্পত্যের স্বর্গ থেকে সে স্খলিত হয়েছিল 'ধৈর্যের উপর ধৈর্য ছিল না' বলে, 'পুরুষের মধ্যে দুর্দান্ত—এমন কি অত্যাচারী রূপ' দেখতে চাইত বলে। নিখিলেশে তার এ অবচেতনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি, পূর্ণ হয়েছিল সন্দীপের মধ্যে, তাই নিজেরই অন্তরালে স্খলনের চোরাপথে পা বাড়িয়েছিল বিমলা। কিন্তু সচেতন মনে সবসময় সে নিখিলেশকে সন্দীপের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করেছে, আর সে কোনোদিনই ভাবেনি স্খলনপথে কোনোদিন তাকে নিখিলেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হতে পারে। স্বামীর ক্রোধের পথে নয়, স্বামীর করুণার পথে যখন সে বিচ্ছিন্নতা এসেছে, তখন বিমলার ভুবন কেঁপে উঠেছে, ইতিমধ্যে সন্দীপের লালসা স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে, যে জায়েদের সে চিরদিন অহেতুক সন্দেহ করত তাদেরই মোহর তাকে চুরি করতে হয়েছে সন্দীপের অর্থলোভে, আত্মগ্লানিতে তার প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর, সন্দীপের প্রতিও সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল ঐ প্রতিক্রিয়ায়। তাছাড়া সন্দীপের রাজনীতির কদর্য চেহারাটাও তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে অমূল্যের হাতে রিভলবার দেখে, বুঝতে পেরেছে দেশের নাম করে সন্দীপ তার কাছে যেমন টাকা নেয় বা নিখিলেশের কাছে নিত, তেমনি এইসব অমূল্যপ্রাণ ছেলেমেদের দিয়ে ডাকাতিও করায়। এসব দেখা-জানা ও বোঝার পর সন্দীপের প্রতি মোহ যখন তার ফিকে হয়ে গেছে তখনই স্বামীর কাছে ছুটি পেয়ে সে ভেবেছে: 'আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ, আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবি নে। কিন্তু ফিরব কেন, মরব।"

মরতে হয়নি বিমলাকে জীবনের দুই পুরুষের দুই দাক্ষিণ্যে। স্বকৃত অপরাধের আত্মগ্লানিতে অনুতাপে বিমলা যখন আঁধার ছাদে আকুল হয়ে কাঁদছিল, তখন নিখিলেশ এসে নিজের করুণাহস্ত রেখেছে তার মাথায়, চাইলেই নিজের ঘরে ফিরতে পারে বিমলা, নিখিলেশের হস্তস্পর্শে ছিল সেই অনুক্ত বাণী। কিন্তু বিমলা কি সত্যিই ফিরতে পারত যদি সন্দীপ তার চরম সর্বনাশ করে থাকত। বহুবার সুযোগ পেয়েছে সন্দীপ, সে নিজে এবং বিমলাও তা লিখেছে নিজ নিজ আত্মকথায়, কিন্তু সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও নারীলোভী সন্দীপ বিমলার সর্বনাশ করেনি তার যে মানসিক বাধায়, সেটা বিবেক-ঘটিত। সে লিখেছে, "নিখিল যে এমন অদ্ভুত, তাকে দেখে যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারি না যে সে আমার বন্ধু।" বন্ধু-স্ত্রী বলেই বিমলার চরম সর্বনাশ করেনি সন্দীপ। তাছাড়া অনেকটা নিজের অগোচরেই বিমলার প্রতি তার একটা যথার্থ ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিল, তাই তার দীর্ঘ শব্দশ্রম, বৈষ্ণব কবিতা, ইংরেজি প্রেমের কবিতা, আধুনিক নর-নারীর মিলন প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় যে জাল সে বিছিয়েছিল তা শূন্যই গুটিয়ে নিয়েছে সে, এমন কি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তার অর্থ, তার গয়নার বাক্স, বলেছে 'আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না— তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী!'—বিদায় বেলার এ স্বীকারোক্তিতে কোনো ছলনা নেই সন্দীপের, এ তার ভালোবাসার উচ্চারণ।

তাহলে আমরা লক্ষ করছি, নিখিলেশের দাম্পত্য ভাবনায় স্ত্রী-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে বিমলা যখন সন্দীপের সংস্পর্শে এসেছে, তখনই তৈরি হয়েছে উপন্যাসের ত্রি-কোণাত্মক কাঠামো, আর সন্দীপের কামনার স্ত্রোত্রে বিমলার নিহিত গোপন প্যাসন দুর্বার হয়ে কথাবস্তুকে

টেনে নিয়ে গেছে ক্লাইম্যাক্সে। অতঃপর নিজ জীবনসাধনার দায়ে বিমলাকে নিখিলেশের মুক্তিদানে, সেই সঙ্গে সন্দীপের অর্থলালসা ও প্রাণনাশী রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিমলা যখন কৃতভুলের অনুতাপে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তখন নিখিলেশ তার দিকে আশ্বাসের সুশীতল হাত বাড়িয়ে দিয়ে কথাবস্তুকে টেনে নিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। সন্দীপের ভ্রান্ত রাজনীতির প্রতিক্রিয়ার আগুনে নিখিলেশের প্রাণ সংশয়ে বিমলা দাঁড়িয়েছে তার ভাগ্য-নির্দেশের মুখোমুখি, যেন তার সারাজীবনের পাপ-পুণ্যের উপর নির্ভর করছে নিখিলেশের মরা-বাঁচা। উপন্যাসের সমগ্র কথাবস্তুই প্রধান চরিত্রত্রয়ের মনোগহীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বান্দ্বিক বিন্যাস। ঘটনা যা আছে প্রত্যক্ষত, তা ঐ অনুভূতি-দ্বন্দ্বের ফল, এবং লক্ষণীয়, মূল বৃত্তে বিমলার স্খলন ও আত্মোদ্ধার ছাড়া ঘটনা প্রায় কিছুই নাই। রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর অধিকাংশেরই কোনো প্রভাব নাই মূল বৃত্তে। বস্তুত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য—এতে আলগা ঘটনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মন চলে নিজের ধর্মে, ঘটনাকে সেই ধর্মে বুঝে, দেখে, বা আনুপাতিক হারে তাতে প্রভাবিত হয়ে।

যেমন বৃত্তরচনায় চরিত্রসমূহের মনস্তত্ত্বের সরল, জটিল বা দ্বান্দ্বিক গতি-প্রকৃতির অনন্য ভূমিকা, তেমনই চরিত্রগুলির স্বরূপ নির্ধারণেও। মনোপ্রকৃতির স্বরূপেই এ উপন্যাসের চরিত্রগুলির চারিত্র-স্বরূপ, তা সে নিখিলেশ, বিমলা বা সন্দীপ যে-ই হোক। তুলনায় চন্দ্রনাথ বাবু, পঞ্চু বা মেজোরাণীতে কিঞ্চিৎ সাহায্য আছে ঘটনার।

উপন্যাসের রস নিষ্পত্তি তথা লেখকের জীবনদর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্বের মুকুরে। নিখিলেশের জীবনের সুর শান্তরসে বাঁধা; বিমলার মনে যে-টুকু আলোড়ন ছিল, জীবনের পথ তথা অভিজ্ঞতা সে আলোড়নকে সমাহিত করেছে ঐ শান্তরসেই। নিখিলেশের যখন প্রাণ সংশয় তখন উদ্বেগের ঘেরার মধ্যে সে দাঁড়িয়েছিল শান্ত মনে, ভাগ্যের নির্দেশ শোনার জন্য; উত্তেজনা তখন তার মধ্যে ছিল না, নিজের পাপ-সচেতনতার কারণে। এই মন্থর শান্ত রসই সংব্যাপ্ত হয় পাঠকে।

নিখিলেশের জীবনদর্শনই লেখকের জীবন দর্শন, তার রাজনীতি-বোধ তথা স্বদেশপ্রেমে ও তার প্রেম তথা নারীমুক্তির মধ্যেও রবীন্দ্র-প্রতীতি অনাহত রূপে স্বপ্রকাশ। উপন্যাসের মৌল বিষয় দাম্পত্য প্রেম তথা নারীমুক্তি বলে তারই মধ্যে লেখকের সংশ্লিষ্ট জীবনদর্শনের রূপাবয়ব লক্ষনীয়। নারী-পুরুষে সমান প্রেমের সম্বন্ধ, সেখানে কেউ পূজ্য কেউ পূজারী নয়, উভয়ে সমান বলেই উভয়ের অধিকার, স্বাধীনতা অথবা প্রতিবদ্ধতাও সমান। নারীর স্বাধীনতা আনতে গিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় ঝড় উঠতে পারে কিন্তু তবুও তাকে স্বাধীনতা দিতেই হবে, নারীকে স্বাধীনতা না দিয়ে পুরুষ নিজের কাছে নিজে সম্মানীয় ও সত্য হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে মুক্তি দিয়ে নারীকে যতখানি পাওয়া যায় সত্য পাওয়া ততখানিই, তার চেয়ে বেশির দাবি পুরুষের পক্ষে নিজের অপমান। বিমলাকে মুক্তি দিয়ে কিছুদিন কষ্ট পেতে হলেও, তারপর যে বিমলাকে পেয়েছে নিখিলেশ সে-পাওয়া আর হারাবে না, কারণ বিশ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিমলা স্পষ্ট করে জেনে নিয়েছে নিখিলেশের মূল্য।

দেখা যাচ্ছে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের প্রতিটি শর্ত পূরণ করেছে 'ঘরে-বাইরে'। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের শিরোভূষণে তাই তার সঙ্গত অধিকার।